Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী জ্ঞান প্রচারে যুগে যুগে মুসলিম নারীদের অবদান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নওশীন তাবাসসুম

রোলঃ 21500292

১১ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী জ্ঞান প্রচারে যুগে যুগে মুসলিম নারীদের অবদান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নওশীন তাবাসসুম

রোলঃ 21500292

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামী জ্ঞান প্রচারে যুগে যুগে মুসলিম নারীদের অবদান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নওশীন তাবাসসুম, আইডিঃ 21500292 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী জ্ঞান প্রচারে যুগে যুগে মুসলিম নারীদের অবদান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

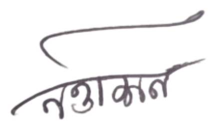

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

নওশীন তাবাসসুম

আইডিঃ 21500292

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
শুরুর কথা	৬
প্রথম অধ্যায়	১৩
উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অবদান	১৩
হযরত আয়িশা (রা:)	১৩
হযরত উম্মে সালামাহ (রা:)	১৯
হযরত হাফসা (রা:)	২২
নববী যুগে মুসলিম নারীদের ইলম অর্জন পদ্ধতি	২৩
নিজের মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে	২৪
উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের জিজ্ঞাসার মাধ্যমে	২৫
সরাসরি আল্লাহর রাসূল মাধ্যমে	২৫
তাবেয়ীদের যুগে মুসলিম নারীদের হাদিস সংরক্ষণ পদ্ধতি	২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	২৮
বিভিন্ন শাস্ত্রে মুসলিম নারীদের অবদান	২৮
পারিবারিক ইলমচর্চা	২৮
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে	২৯
মাহরামের সাথে সফরের মাধ্যমে	৩০
হাদিসশাস্ত্রে	৩২
ফিকহশাস্ত্রে	৩৪
তাজওয়ীদ ও ক্বেরাতশাস্ত্রে	৩৮
নারীদের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা	৪০
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব	৪৩
তৃতীয় অধ্যায়	৪৪
উম্মাহর কিংবদন্তী বিনির্মাণে মায়েরা	৪৪
ইমাম মালিকের মা	৪৪

বিষয়বস্তু	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
ইমাম শাফেয়ীর মা	৪৫
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মা	৪৫
ইমান সুফিয়ান ইবনে উনাইনার মা	৪৬
ইমাম বুখারীর মা	৪৭
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মা	৪৮
মুহাম্মাদ আল ফাতিহের মা	৪৮
ইমাম যায়নুদ্দীন দিমাশকীর মা	৪৯
বদিউজ্জামান সাইয়্যেদ নুরসীর মা	৪৯
ইমাম আওকাসের মা	৫০
মায়ের নামে পরিচিত হয়েছেন যে আলিমগণ	৫১
শেষের কথা	৫২
তথ্যসূত্র	৫৪

শুরুর কথা

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়া ও মেহেরবানী এই যে তিনি আমাদেরকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জানার তৌফিক দান করছেন যে বিষয় সম্পর্কে জানা ও এর ইতিহাসের উপর আমল করা আজ প্রত্যেক মুমিনা নারীদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিষয়টি হচ্ছে 'ইসলামী জ্ঞান প্রচারে যুগে যুগের মুসলিম নারীর অবদান'। এখানে ইসলামী জ্ঞান দ্বারা মূলত ইলম শব্দটিকে নির্দেশ করা হয়েছে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে নববী যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইলমের প্রচার-প্রসারে মুসলিম নারীগণ কি অবদান রেখে গেছেন আমরা জানবো সে ইতিহাস সম্পর্কে।

যেহেতু আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে 'ইলম বা ইসলামী জ্ঞান' সেহেতু শুরুতেই ইলম কি, ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত কেমন হওয়া চাই, ইলমচর্চার গুরুত্ব এবং তা প্রচারের ফজিলত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান রাখা অপরিহার্য।

আরবী ভাষায় ‘ইলম' শব্দটি দ্বারা জ্ঞান, অনুধাবন ও উপলব্ধি করাকে বোঝানো হয়। বাংলা ভাষায় কখনো কখনো এলেম শব্দটি দ্বারাও একে বোঝানো হয়, যার অর্থ হল; জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা বা বিদ্যা। তবে ইসলামী পরিভাষায় ইলম শব্দটি দ্বারা শুধুমাত্র 'ইসলামী জ্ঞান' কেই বোঝানো হয়ে থাকে। কুর'আন, হাদিস, ফিকহ, তাজওয়ীদ, তাসাউফের জ্ঞান থেকে শুরু করে সমসাময়িক সকল মতবাদ, জীবনব্যবস্থা ও দর্শনসহ ইসলামের মেজাজের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রতিটি বিষয়সমূহই ইসলামী জ্ঞান বা ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

এই পর্যায়ে ইলম অর্জনের ফজিলত সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হলো।

আয়াতসমূহ:

১. সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে-

‘পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি (সব কিছু) সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা। পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

(সূরা আলাক: ১-৫)

২. তবে কি (এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোতে ইবাদত করে, কখনও সিজদাবস্থায়, কখনও দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে? বল, যারা জানে আর যারা জানে না উভয়ে কি সমান? (কিন্তু) উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে। (সূরা যুমার:৯)

৩. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন।তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। (সূরা মুজাদালাহ: ১১)

৪. আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-

'আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও ‘উলুল ইলমও’ যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন।তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।

(সূরা আলে ইমরান : ১৮)

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, ‘উলুল ইলম’ দ্বারা উদ্দেশ্য-

'মুমিনদের আলেমগণ'।

হাদিসসমূহ:

১. আবূ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে-

"'যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে ইলম অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।'

'আর ফেরেশতাবর্গ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলিম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।'

'আবেদের উপর আলিমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত।'

'উলামা সম্প্রদায় পরগম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইলমের (দ্বীনী জ্ঞানভাণ্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল।'"

(আবূ দাউদ ৩৬৪১, দারেমী ৩৪২)

২. হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললেন-

'সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ।'

(জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫)

৩. ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

'কেবল দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।'

(সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩১৬, মুসলিম ৮১৬, ইবনু মাজাহ ৪২০৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮)

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন-

'হে আবু যর! কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক।'

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯)

৫. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

'যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে ইলম অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।'

(মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫৪, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪)

৬. উক্ত রাবী (আবূ হুরাইরা) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি-

‘ইহজগৎ অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে সব অভিশপ্ত। তবে মহান আল্লাহর যিকির ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া (তাঁর আনুগত্য) এবং আলেম অথবা তালিবে ইলমের কথা স্বতন্ত্র।’

(তিরমিযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২)

উক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই খাস, উভয়ের ক্ষেত্রেই এর মর্যাদা ও ফজিলত সমান। কন্যা ও পুত্রদের সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কারো যদি একজন কন্যাসন্তান থাকে এবং সে তাকে হত্যা করেনি, কোনো ধরনের অবহেলা করেনি এবং পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তানের ওপর কোনো ধরনের প্রাধান্য দেয়নি। আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৫১)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার দুই আয়াতের মাধ্যমে শেষ করেছেন, যা আমাকে আরশের নিচের ভাণ্ডার থেকে প্রদান করা হয়েছে। অতএব, এগুলো তোমরা নিজেরা শেখো ও তোমাদের নারীদের শেখাও। ’ (দারেমি, হাদিস : ৩৪৩০)

ইলম প্রচারের ফজিলত:

১. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

‘যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানাবে, সে তার অনুসারীদের সমতুল্য নেকীর অধিকারী হবে; তাতে তাদের নেকীর কিছুই হ্রাস পাবে না।’

(মুসলিম ২৬৭৪, তিরমিযী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৪৬০৯, আহমাদ ৮৯১৫, দারেমী ৫১৩)

২. সাহাল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন-

‘আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উঁটনী অপেক্ষা উত্তম হবে।’

(সহীহুল বুখারী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসলিম ২৪০৬, আবূ দাউদ ৩৬৬১, আহমাদ ২২৩১৪)

৩. আল্লাহর রাসূল স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।’

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭)

৪. আবূ হুরাইরা) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

‘আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদাকায়ে জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন করে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইলম (জ্ঞান সম্পদ) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য নেক দো’আ করতে থাকে।’

(মুসলিম ১৬৩১, তিরমিযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাউদ ২৮৮০, ৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, দারেমী ৫৫৯)

ইলম অর্জন ও ইলম প্রচারে নিয়ত যেমন হওয়া চাই:

সবসময় এভাবে ভাবতে হবে ‘ইলম অন্বেষণ করা,ইলমের জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভূত হয়।সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন

ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম ইলম অর্জন করবো এবং তার প্রচার প্রসারের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

'পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে।'

(আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭)

এইপর্যায়ে আমরা সরাসরি আমাদের আলোচনার মূল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করবো। শুরুতেই আমরা চলে যাবো আজ থেকে সাড়ে ১৪০০ বছর পূর্বের সময়টাতে। আমরা জানবো উম্মাহর সেইসকল নারী সাহাবী,তাবেয়ী,তাবে-তাবেয়ী ও তৎপরবর্তী উম্মাহর সেইসকল মর্যাদাবান মহীয়সী নারীদের সম্পর্কে যারা তাদের পুরো জীবনকে অতিবাহিত করে গেছেন ইলমের প্রচার প্রচারে, মুসলিম উম্মাহর জন্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়ালা উনাদের উপর রহম করুন।

প্রথম অধ্যায়

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অবদান

উম্মাহাতুল মু'মিনীনরা হচ্ছেন মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় সম্পদ। নববী জ্ঞান অর্জনের প্রধানতম দরজা। কেননা তারাই সবচেয়ে বেশি সময় ধরে নবীজীর সাহচর্য লাভ করেছেন। যতটা কাছ থেকে তারা নবীজীর উপর ওহী নাজিল হতে দেখেছেন এবং সেই ওহীর জ্ঞানের উপর নবীজীকে আমল করতে দেখেছেন তা অন্য কোনো সাহাবীর দেখার সুযোগ হয়নি।

তাই আমরা প্রথমেই শুরু করবো ইসলাম প্রচারে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের কি অবদান সেই সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে।

হযরত আয়িশা (রা:)

উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে মুসলিম উম্মাহ সবচেয়ে বেশি যার দ্বারা উপকৃত হয়েছে তিনি হচ্ছেন আম্মিজান হযরত আয়িশা (রা:)। নবীজীর (সা:) সঙ্গে যখন উনার বিয়ে হয় তখন উনার বয়স ছিলো মাত্র ৭ বছর। ৯ বছর বয়সে তিনি স্বামীগৃহে পদার্পণ করেন। ছোট থেকেই উনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ও তার স্মৃতিতে গেঁথে থাকতো। এরই ফলস্বরূপ উনার শৈশবকাল থেকে শুরু করে নবীজীর (সা:) ওফাতের সময় পর্যন্ত উনার সামনে সংঘটিত কুর'আন ও হাদিসের প্রতিটি ঘটনা ও মাস'আলা দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ উপকৃত করেছেন।

তিনি ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'যখন সূরা ক্বমারের ৪৬ নম্বর আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয় তখন আমি খেলছিলাম।' (সহীহ বুখারী, তাফসিরে সূরা ক্বমার)। এটা থেকেই বুঝা যায় যে খেলার সময়ও যে মহান মহিয়সীর দৃষ্টি এড়ায়নি

নবুয়তী বিষয়সমূহ থেকে মাত্র আট বছর বয়সেও; আল্লাহ তার বাকি জীবনজুড়ে উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে কি বিপুল পরিমাণ খেদমত নিতে চলেছেন ভবিষত উম্মাহর জন্য তার মাধ্যমে।

হজরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে তিনি বলেন-‘আমি গর্বের জন্য নয়, বরং বাস্তব কথাই বলছি। আর তা হলো, আল্লাহ তায়ালা এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাকে দান করেছেন যা আর কাউকে দান করেননি।

ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে দেখিয়েছেন।

আমার সাত বছর বয়সে রাসূল(সা.) আমাকে বিয়ে করেছেন।

মাত্র নয় বছর বয়সে আমি স্বামীগৃহে প্রবেশ করেছি।

আমিই ছিলাম রাসূল (সা.)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী।

যখন তিনি আমার বিছানায় থাকতেন তখন ওহি নাজিল হতো।

আমি ছিলাম রাসুল(সা.)এর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী।

আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করে কোরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে।

জিব্রাইল(আ.)-কে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

রাসূল (সা.) আমার কোলে মাথা রেখে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আমি তার খলিফা ও তার সিদ্দিকের কন্যা।

আমার ঘরেই তার কবর দেওয়া হয়েছে।’

যে ৭জন সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম হাজারের উপর হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়িশা (রা:) একজন। তিনি মোট আল্লাহর রাসূল (সা:) থেকে ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে, ফাতওয়া প্রদানে, আকিদাহ ও ধর্মীয় বিধানের নিগূঢ় রহস্য উৎঘাটনে আম্মিজান হযরত আয়িশা (রা:) বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। যেমন:

১. কোনো বিষয় না বুঝলে বারবার জিজ্ঞাসা।

কোনো ইলমী বিষয় আলোচনার পর নবীজী যেটুকু বলতেন সাহাবীরা সাহাবীরা সেটুকুই রপ্ত করে নিতেন। কিন্তু আয়িশা (রা:) এর অভ্যাস ছিলো তার কোনো ইলমী বিষয় যতক্ষণ না পুরোপুরি বুঝে তিনি আল্লাহর রাসূলকে সে সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে তা ভালোভাবে জেনে নিতেন। (সহীহ বুখারী: কিতাবুল ইলম)

২. দ্বীনের তাৎপর্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অনেক পুরুষ সাহাবীদের চেয়েও হযরত আয়িশাকে (রা:) ইলমী বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা ও বুঝের উপলব্ধি অনেক বেশি দান করেছিলেন। যার কারণে অসংখ্য হাদিসের ব্যাখায় অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে অধিকাংশ সময় তার উল্লেখিত মতটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতো।তার প্রখর স্মৃতিশক্তির বদৌলতে যখনই কোনো সাহাবী হাদিস বর্ণনায় শব্দের হেরফের করতেন বা কোনো হাদিসের মর্মাথ সম্পর্কে শোনায় বা বোঝায় ভুল করতেন সাথে সাথে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন।

৩. হাদিস বর্ণনায় সতর্কতা।

হাদিস বর্ণনায় তিনি এতোবেশি সতর্ক ছিলেন যে, যে হাদিস তিনি সরাসরি রাসূল (সা:) থেকে শোনেননি বরং তা অন্য কোনো সাহাবীর বর্ণনায় জেনেছেন; কেউ তার কাছে সে হাদিস সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাকে সেই সাহাবীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন যিনি হাদিসটির সর্বপ্রথম বর্ণনাকারী।

৪. ইজতিহাদের ক্ষমতাশক্তি ও প্রয়োজনীয় মত প্রকাশের ক্ষমতা।

ফিকহী বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় অনেক সাহাবীদের সাথেই উনার মতের ইখতেলাফ ছিলো। আকিদাগত বিভিন্ন বিষয় যেমন: আল্লাহর দর্শন লাভ, কবর, কিয়ামত, হাশর ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আয়িশা (রা:) এর মতামত পরবর্তীতে ইসলামী আকিদার শাখা-প্রশাখা বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মাস'আলাগত বিভিন্ন বিষয় যেমন: ফরজ গোসল,

ঋতুবতী হওয়া, নারী সংক্রান্ত কুসংস্কার ও নেতিবাচক ধারণার খন্ডনে তার থেকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ও বিস্তারিত মাসায়েল জানা যায়।

৫. গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।

আমলের ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র হারাম-হালাল, জায়েজ-নাজায়েজ দেখতেন না বরং সবসময় যেটি তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই বিষয়টির উপর আমলের করার চেষ্টা করতেন। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের নিগূঢ় অর্থ বুঝার ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে দান করেছিলেন।

হজরত উরাইরা ইবনে যুবাইর (রা.) বলেন, 'আমি হালাল-হারাম, জ্ঞান, কবিতা ও চিকিৎসাবিদ্যায় হজরত আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে বেশি পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি।' (যুরকানি : ৩/২২৭)

প্রখ্যাত তাবেয়ি হজরত মাসরুখ (রহ.) হজরত আয়েশা (রা.)-কে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি বড় বড় সাহাবিদের তার কাছে ফারায়েজ (উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধিবিধান) বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখেছি।'

হজরত আবু মুসা আশয়ারি (রা.) বলেন, 'আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদিসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখন আয়েশা (রা.)-এর কাছে তা জিজ্ঞেস করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।' (জামে তিরমিজি : ৩৮৮৩)

হযরত আয়িশা (রা:) থেকে বর্ণিত হাদিস সংকলনে যিনি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন তিনি হলেন আবু বকর ইবনে হাযাম আল আনসারী (রহি.)। হিজরী একশত সনে তিনি এইসকল হাদিস সংকলন করেন হযরত উমরাহ (রা:) এর বিশেষ সাহচর্য থেকে। হযরত উমরাহ (রা:) হযরত আয়িশা (রা:) এর পোষ্যকন্যা ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীনের প্রতিপালনে যার বেড়ে উঠা। যখন হাদিস সংকলনের যুগ শুরু হলো তখন আম্মিজান আয়িশার এই পালিত কন্যাই তার ইলমে হাদিসের উত্তরসূরি হিসেবে তার জ্ঞান পৌছে দেন পুরো মুসলিম জাহানের নিকট।

ইলমের প্রচার-প্রসারে:

আল্লাহর রাসূল (সা:) এর ওফাতের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আম্মিজান হযরত আয়িশা (রা:) নববী জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গিয়েছেন। সে সময় প্রাতিষ্ঠানিক কোনো মাদ্রাসা ব্যবস্থা যদিও ছিলোনা কিন্তু প্রত্যেক সাহাবীগণই ছিলেন এক একটি মাদ্রাসা। যারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দ্বীনের প্রচার প্রসারে কাজ করেছেন। হযরত আয়িশাও (রা:) এর ব্যতীক্রম নন। তার ঘরই ছিলো তার মাদ্রাসা। ঘর থেকেই তিনি ইলমের সুঘ্রাণ ছড়িয়েছেন উম্মতের মাঝে।

ইলমের প্রচারে তিনি সে পন্থাগুলো অবলম্বন করেছেন তা নিম্নরূপ:

নিয়মিত দরসদান:

হযরত আয়িশা (রা:) এর ঘর ছিলো মাসজিদুল নববীর সাথে লাগোয়া। নিয়মিত ইলমী দারসের ব্যবস্থাপনা ছিলো এমন যে নারী, শিশু ও মাহরাম আত্মীয়রা ঘরের ভেতর অবস্থান করতেন। ঘরের বাইরে দরজার সামনে বড় করে পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হতো। আগত শিক্ষার্থীরা মসজিদে নববীতে উনার হুজরার নিকটবর্তী স্থানে বসে দারসে অংশ নিতেন। মাহরাম আত্মীয়রা প্রশ্ন করতো। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে সেগুলোর উত্তর দিতেন। মাঝেমধ্যে নিজে থেকেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন।

হজ্জের সফরে:

প্রতিবছর হজ্জের মৌসুমে হেরা ও সাবির পর্বতের মাঝামাঝি জায়গায় আম্মিজান হযরত আয়িশার (রা:) তাবু স্থাপন করা হতো। দূর-দূরান্ত থেকে হজ্জযাত্রীরা এসে ভীর জমাতো উনার তাবুর সামনে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা রাখতেন, তারা কোনো প্রশ্ন করলে সেগুলোর উত্তর দিতেন। যদিও তখন উনার মাহরাম হিসেবে পিতা,স্বামী বা সন্তান ছিলেননা, কিন্তু আল্লাহ উনার কাজের সহযোগী হিসেবে বোনপুত্র, দুধ সম্পর্কীয় মাহরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

মাহরাম বানানো:

যদিও হযরত আয়িশা (রা:) এর কোনো সন্তান ছিলোনা। কিন্তু তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনের সন্তানদের, শহরের ইয়াতীম-অসহায়-দরিদ্র, প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নিতেন। ছোট থাকতেই গাইরে মাহরাম ছেলেদেরকে নিজের বোন-খালা-ভাতিজীর দুধ পান করিয়ে দুধখালা, দুধনানী, দুধবোন হয়ে যেতেন। এরপর এদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইলম শিক্ষাদান করতেন, নিজের ইলমের ওয়ারিস বানাতেন। যেসব সাহাবী-তাবেয়ীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো অর্থ্যাৎ বালেগ হওয়ার পর থেকে আয়িশা (রা:) এর সরাসরি সোহবত বা সাক্ষাতলাভে ইলম অর্জন থেকে বঞ্চিত হতেন তারা সারাজীবন এর জন্য আফসোস করতেন। তাবেয়ী কুবাইসা (রহি.) আক্ষেপ করে বলতেন,'উরওয়াহ আমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, সে ভেতরে যাওয়ার সুযোগ পেতো' (তাহযীব ইবনে হাজার, তরজমায়ে আয়িশা (রা:))। বিশিষ্ট তাবেয়ী ইব্রাহীম নাখয়ী যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এজন্যই হয়ে উঠতে পেয়েছিলেন যে তিনি মাহরাম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে আম্মিজান আয়িশা (রা:) সরাসরি সোহবত লাভ করেছেন।

শিক্ষার্থীদের দেখভাল:

আল্লাহর রাসূল যেমন ছিলেন উম্মাহর জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক, তেমনই তার প্রিয়তমা হযরত আয়িশাও (রা:) হয়ে উঠেছিলেন সর্বোত্তম শিক্ষিকা। তিনি শুধুমাত্র তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়াতেনই না। বরং তাদের সকল সুবিধা,অসুবিধা, ভালো-মন্দ সকল কিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী তাকে কিছু বলতে বা জিজ্ঞেস করতে ইতস্ততবোধ করতো তিনি তাদেরকে স্নেহের সাথে অভয় দিয়ে বলতেন 'তুমি যেভাবে তোমার মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারতে, সেভাবে আমাকেও জিজ্ঞেস করতে পারো।' (মুসনাদে আহমাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০)। তিনি শুধু শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না বরং শিক্ষার্থীদের তালিম,তরবিয়ত ও উত্তম আখলাক গঠনে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন।

হযরত উম্মে সালামাহ (রা:)

উম্মে সালামা (রা:) এর প্রকৃত নাম হচ্ছে হিন্দ। উম্মে সালামা উনার কুনিয়াত বা উপনাম। উনার প্রথম স্বামীর নাম ছিলো আবু সালামা (রা:)। উনারা ইসলামের শুরুর যুগেই ইসলাম কবুল করেন, ইসলামের জন্য হিজরত করেন। উহুদ যুদ্ধে আবু সালামার বাহুতে শত্রু বাহিনীর একটি তীর এসে লাগলে তিনি দীর্ঘদিন এর যন্ত্রণা ভোগের পর অবশেষে আরোগ্য লাভ করেন। এর কিছুদিন পর আল্লাহর রাসূল তাকে ক্বাত্বান অভিযানে পাঠালে সেখানে ২৯ দিন অবস্থানের পর তিনি মদিনায় ফিরে আসেন। এই সফরে তার পুরোনো জখমের ব্যাথা আবারও ভেসে উঠে এবং তার জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে ৪র্থ হিজরীর জমাদিউস সানীর ৯ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুবরণ কালে তিনি আল্লাহর কাছে দুয়া করে যান আল্লাহ যেন উম্মে সালামাকে তার চেয়েও উত্তম জীবনসঙ্গী দান করেন।

অপরদিকে স্বামীর মৃত্যু হলে অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উম্মে সালামা এই খবর আল্লাহর রাসূলের কাছে পৌছায়। রাসূল (সা:) তাৎক্ষণিক তার গৃহে তাশরীফ আনেন। উম্মে সালামাহ তখন একদিকে শোকে বিহবল অভিভাবকহীন নারী, অন্যদিকে তার গর্ভে রয়েছে আবু সালামার সন্তান। আল্লাহর রাসূল (সা:) পরিস্থিতির বিবেচনায় হযরত উমারের মাধ্যমে তাকে বিয়ের পাঠালে প্রথমে তিনি কিছুটা ইতস্ততবোধ করেন। পরে সম্মতি প্রদান করলে ইদ্দত শেষে আল্লাহর রাসূলের সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়।

শুরু জীবন থেকেই তিনি যেমন ইসলামের প্রতি আন্তরিক ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার পর তার এই আগ্রহ ও আন্তরিকতা শতগুণে বেড়ে যায়। যখন আল্লাহর রাসূল মিম্বরে 'ইয়া আইয়্যুহান্নাস! (হে মানবসকল!)' শব্দটি উচ্চারণ করতেন তিনি সকল কাজ ফেলে তা শোনার জন্য ছুটে যেতেন। একবার একজন তার মাথায় বিনুনী করে দিচ্ছিল এমন সময় মিম্বার থেকে এই ডাক শুনতে পান। সাথে সাথে তিনি বলেন,'চুল বেঁধে দাও'। সে বলল,'এতো তারা কিসের? মাত্রই তো হে লোকসকল বলল'। তিনি বললেন,'আমরা কি লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই?'। তারপর তিনি নিজেই দ্রুত চুল বেধে

উঠে যান এবং সম্পূর্ণ ভাষণটি মনোযোগ সহকারে শোনেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১৯৯৯,২৬৫৪৬)

এরকমভাবে যখনই আল্লাহর রাসূল কোনো বিষয় বলতেন তিনি খুব মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করতেন। সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরি (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: এক মহিলা (আসমা বিনতে ইয়াযীদ) রাসূল (সা:) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন,'ইয়া আল্লাহর রাসূল! আপনার হাদিস শুধুমাত্র পুরুষরাই শেখার সুযোগ পাচ্ছে, আমাদেরও কোনো একদিন শেখার সুযোগ দিন। রাসূল (সা:) বললেন,'তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে একত্রিত হবে।' মহিলাগণ নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত হলে আল্লাহর রাসূল (সা:) তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন।' (সহীহ বুখারী: ২০০২, ১০১)

উম্মে সালামা (রা:) সবসময় এ সকল হালাকায় উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। এছাড়াও তিনি যখনই আল্লাহর রাসূল থেকে কোনো হাদিস সাথে সাথে তা মুখস্থ করে নিতেন। এ সম্পর্কে মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রা:) বলেন, 'রাসূল (সা:) এর স্ত্রীগণ নবী (সা:) থেকে প্রচুর হাদিস মুখস্থ করতেন। তবে এক্ষেত্রে আয়িশা (রা:) এবং উম্মে সালামা (রা:) এর কোনো জুড়ি ছিলনা। (আল বালাজুরী, ১/৪১৫)

তিনি রাসূলুল্লাহ ছাড়াও পূর্ব স্বামী আবু সালামা এবং নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (রা:) থেকেও হাদিস বর্ণনা করেন। নারীদের মধ্যে হাদিস বর্ণনায় আয়িশা (রা:) এর পরেই তার স্থান। তিনি সর্বমোট ৩৭৮ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিনি যে শুধুমাত্র হাদিসশাস্ত্রেই অবদান রেখেছেন তা নয় ফিকহ শাস্ত্রেও তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যখনই তিনি কোনো বিষয় সম্পর্কে বুঝতেন না বা জানার প্রয়োজনবোধ মনে করতেন আল্লাহর রাসূল (সা:) থেকে সে ব্যাপারে জেনে নিতেন। নবীজীর সংস্পর্শে থাকাকালীন চাক্ষুষ বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। আল্লাহর রাসূলকে কেউ কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি মনোযোগ দিয়ে প্রশ্নোত্তরগুলো শ্রবণ করতেন এবং সেগুলো মনে রাখতেন।

ইলমের প্রচার-প্রসারে:

নবীজীর মৃত্যুর পর মদিনা পরিণত হয় জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রে। আয়িশা (রা:) এর মতো তিনিও মানুষদেরকে ইলমে নববী শিক্ষাদান শুরু করেন। বিশিষ্ট সাহাবী ও পরবর্তীতে তাবেয়ীদের একটি জামায়াত তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে তার গৃহের সন্নিকটে জড়ো হতেন। তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে ফিকহী ইলমের দরজা মানুষের নিকট প্রশস্ত করেছেন। তার থেকে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী মাস'আলাগুলোর মধ্যে রাসূল (সা:) এর পারিবারিক জীবন, নামাজরত অবস্থায় মাটিতে ফু দেয়া প্রসঙ্গ, মসজিদ থেকে পুরুষদের পরে বের হওয়া, আসরের পর নফল নামাজ, ইস্তেহাযা অবস্থায় নামাজ, হায়েজ ও নেফাজকালীন কাযা নামাজ, নাপাক অবস্থায় রোজা, তাওয়াফ সংক্রান্ত, সঞ্চিত সম্পদের যাকাত সম্পর্কিত, মেয়েদের স্বপ্নদোষ, ওজুর পানি মোছা, গর্ভাবস্থায় ইদ্দত, ইদ্দতকালীন সাজসজ্জা, নারীর পর্দা, হিজরাদের সাথে আচরণবিধি, দাসমুক্তি, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি বিষয়গুলো এর অন্যতম।

এছাড়াও উম্মে সালামা (রা:) এর বিশেষ গুণ ছিলো তিনি খুব সহজেই মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন সাহাবারা দিশেহারা অবস্থায় আল্লাহর রাসূলের আদেশ পালনে দ্বিধা করছিলেন তখন তিনি নবীজীকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তার প্রয়োগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। বর্তমান সমসাময়িক ফিতনা যেমন ট্রান্সজেন্ডার, হিজরা, নারীরা কি পুরুষের চেয়ে মর্যাদায় কম বা কম সওয়াবের অধিকারী যেহেতু দ্বীনের অনেক বিষয়েই আল্লাহ তাদেরকে শৈথিল্য দান করেছেন। এমন বিষয়ে ১৪০০ বছর আগে তার প্রশ্ন এবং আল্লাহর রাসূলের বর্ণিত পন্থাই আমাদের জন্য সর্বোত্তম।

হযরত হাফসা (রা:)

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.) ছিলেন মেধার দিক থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। আয়িশা (রা:) এর মতো তিনিও সম্পূর্ণ কুর'আন হিফজ করেছিলেন। উপকারী বিভিন্ন বিষয় শেখার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিলো। আল্লাহর রাসুল (সা.) তার জ্ঞানসন্ধ্যানী মনোভাব বুঝতে পেরে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তৎকালীন আরবে যে কজন নারী সাহাবি লিখতে ও পড়তে জানতেন তাদের মধ্যে শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) ছিলেন অন্যতম। রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর নির্দেশে তিনি হজরত হাফসা (রা.)–কে পড়তে ও লিখতে শিখিয়েছেন।

এ সম্পর্কে শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা নবী (ﷺ) আমার নিকট আসেন, যখন আমি হাফসা (রাযিঃ)–এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন-

‘তুমি তাকে কেন নামলা (এক প্রকার রোগ সারার মন্ত্র) শিখাও না, যেমন তুমি তাকে লেখা শিখিয়েছ?’

(আবু দাউদ: ৩৮৮৭)

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় আল্লাহর রাসূল (সা:) স্বামী হিসেবে তার স্ত্রীদের ইলম অর্জনের পাশাপাশি ঘরোয়া জীবনে কাজে আসবে এমন বিদ্যায়ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে কতটা উৎসাহী ছিলেন। উনার উৎসাহেই স্ত্রীগণ হাদিস, ফিকহ, তাজওয়ীদসহ নববী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান লাভের পাশাপাশি ঝাড়ফুক, প্রাথমিক চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিতে জ্ঞানার্জন করেন।

হাদিসশাস্ত্রেও হাফসা (রা.) অবদান রেখেছেন। তার থেকে সর্বমোট ৬০টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিসগুলো তিনি সরাসরি রাসুল (সা.) এবং উমর (রা.) এর কাছ থেকে শুনেছেন।

আয়েশা (রা.) এর সাথে হাফসা (রা.)–এর সম্পর্ক ছিল বোনের মতো। দুজন সতীনের চেয়ে বেশি বান্ধবী ছিলেন। আয়েশা (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, হাফসার বাবা যেমন প্রতিটি কথা ও কাজে দৃঢ়সংকল্প, হাফসাও তেমন। (আবু দাউদ)।

উম্মুল মু'মিনীন হাফসাকে (রা:) আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এমন একটি মর্যাদা দান করেছেন যা অন্য কোনো নবীপত্নীকে দেননি। তা হলো কুর'আনুল কারীমের ত্রুটিমুক্ত একমাত্র পান্ডুলিপিটি নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখার সৌভাগ্য। আবু বকর (রা:)এর শাসনামলে ইয়ামামার যুদ্ধে যখন অসংখ্য হাফেজ সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন তখন উমর (রা:) এর পরামর্শে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা:) এর তত্ত্বাবধানে প্রথম লিখিতভাবে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম ও যাচাই-বাছাইয়ের পর সর্বপ্রথম কুর'আনুল কারীমের পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত হয়। পরবর্তীতে তা উমার (রা:) এর কাছে সংরক্ষিত থাকে। উনার ইন্তেকালের পর আমানত ও বংশীয় সূত্রে মর্যাদাবান সেই মুসহাফ সংরক্ষণের দায়িত্ব হাফসা (রা:) লাভ করেন। পরে এর অনেকগুলো কপি প্রস্তুত করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

নববী যুগে নারী সাহাবীদের ইলম অর্জন পদ্ধতি:

ইসলাম আগমনের পর মুসলিম নারীগণ শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়েই নিজেদের জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তারা দ্বীন সম্পর্কে জেনেছেন, শিখেছেন, পালন করেছেন এবং হৃদয় দিয়ে এই দ্বীনের গভীরতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন।

শুরুর যুগে মুসলিম নারীগণ তিন পদ্ধতিতে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতেন-

১. নিজের মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে।

২. উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নিকট জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে।

৩. আল্লাহর রাসূল উপস্থিত আছেন এমন মাজলিশে উপস্থিত হয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে।

নিজের মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে:

সাহাবায়ে কেরাম (রা:) নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশি আল্লাহর রাসূল ভালোবাসতেন। আল্লাহর রাসূলের সোহবতে থেকে দ্বীন শেখা এবং এর উপর ব্যবহারিক জীবনে আমল করা ছিলো তাদের জীবনের বড় উদ্দেশ্য। সাহাবায়ে কেরাম (রা:) এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নবীজীর সোহবতে যেতেন এবং ঘরে ফিরে নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানাদিদের সাথে আলোচনা করতেন 'আজ তিনি নবীজীর ইলমী মাজলিশ থেকে কি শিখে এসেছেন'। সাহাবীরা নিজেরা যেমন এর উপর আমল করতেন, তেমনি পরিবারবর্গকেও এর উপর আমলের তাগাদা দিতেন। দেখা যেতো সাহাবায়ে কেরাম যখন দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে জিহাদে বা দাওয়াতের কাজে বের হয়ে যেতেন। মুসলিম নারীগণ তখন যেসব ইলম তারা স্বামীগণের কাছ থেকে অর্জন করেছেন তা নিজেদের শিশু সন্তানদের শেখাতেন। এভাবে সে যুগে ইলম ঘর থেকে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রথম পদ্ধতির ইলমী ধারাবাহিতা ছিল নিম্নরূপ:

আল্লাহর রাসূল (সা:)- সাহাবীগণ- তাদের স্ত্রীগণ- তাদের সন্তানগণ।

দলিল: একবার রাসূলুল্লাহ (সা:) দুনিয়া থেকে ইলম উঠে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করলেন। তখন যায়েদ ইবনে লাবিদ আনসারী (রা:) বললেন,'সেটা কিভাবে আমাদের থেকে উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পড়েছি ও তা পড়তেই থাকবো এবং আমাদের নারী ও সন্তানদেরও তা পড়াবো।'

উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নিকট জিজ্ঞাসার মাধ্যমে

নারী সাহাবীগণ যখন কোনো বিষয় জানার বা বুঝার প্রয়োজনবোধ করতেন তখন তারা সরাসরি নবী পত্নীদের নিকট গিয়ে তা জেনে বা বুঝে নিতেন। আবার মাঝেমধ্যে নবী পত্নীদের মাধ্যম বানিয়ে তারা তা নবীজীর থেকে জেনে নিতেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতির ইলমী ধারাবাহিতা ছিলো নিম্নরূপ:

আল্লাহর রাসূল- নবী পত্নীগণ- নারী সাহাবীগণ- পরবর্তী প্রজন্ম।

দলিল: (ঋতুস্রাব সংক্রান্ত দলীল আনতে হবে)

সরাসরি আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে:

ইমাম বুখারী (রহি.) তার সহীহ বুখারী নামক হাদিসের কিতাবে 'নারীদের দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য কি আলাদা দিন ধার্য্য করা হবে?' এই শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই রচনা করেছেন। যেখানে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে নববী যুগে মুসলিম নারীগণ যেন নবীজীর কাছ থেকে সরাসরি ইলম অর্জন করতে পারে সেজন্য আলাদা একটি দিনই নির্ধারিত ছিলো। তারা সেই দিনগুলোতে নবীজীর মাজলিশে উপস্থিত হতেন এবং পর্দার আড়াল থেকে নবীজীকে দ্বীন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন এবং নবীজী সেগুলোর উত্তর দিতেন।

তৃতীয় পদ্ধতির ইলমী ধারাবাহিতা ছিলো নিম্নরূপ:

নবীজী- নারী সাহাবীগণ।

এক্ষেত্রে দুটি শর্ত ছিল।

*মাজলিশের সময় পূর্ব নির্ধারিত হওয়া। *মুসলিম নারীগণ পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞাসা করা।

দলিল: (বইয়ের ১৮-১৯ পেইজ থেকে)

তাবেয়ীদের যুগে নারীদের হাদিস সংরক্ষণ পদ্ধতি:

উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ যেভাবে একেকজন নিজেদের মওত পর্যন্ত নববী ইলমের আমানতকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন, তেমনই নারী সাহাবীগণ সেই ইলমী আমানত নিজেদের বংশ পরম্পরায় রক্ষার্থে প্রজন্ম নির্মাণে নিজেদের জান-মাল সবকিছু উৎসর্গ করেছেন।

এই উম্মাহ শুধুমাত্র ওহী নাযিলের মধ্য দিয়েই বিজয়ী হয়নি, বরং এই ওহীর জ্ঞানকে টিকিয়ে রাখতে এই উম্মাহর নারী ও পুরুষগণ যুগের পর যুগ ধরে সংগ্রাম করে গেছেন।

সাহাবীযুগের পর স্বাভাবিকভাবেই এই ইলমের আমানতদারীতার দায়িত্ব অর্পিত হয় তাবেয়ীযুগের মানুষদের উপর। নারী তাবেয়ীগণ উত্তরাধিকার সূত্রে এই ইলমের আমানতদারিতাকে তাবেয়ী যুগেও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের পরিবারের বৃদ্ধা সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছে থাকা হাদিসসমূহ শ্রবণ করেছেন। তারপর সেগুলো নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করেছেন। এভাবে যখন হাদিস সংকলনের যুগ শুরু হলো পুরুষদের পাশাপাশি নারীগণও নিজেদের সংরক্ষণে থাকা হাদিসগুলো গ্রন্থাকারে সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন। নিচে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

- হযরত খায়রাহ (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন সালামা (রা:) থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। তিনি সেই হাদিস বর্ণনা করেছেন তার দুই পুত্র হযরত হাসান বসরী (রহ.) ও হযরত সাঈদ বসরী (রহ.) এর কাছে। তারা দুজন সেই হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন তাদের পরবর্তীদের কাছে।

- হযরত উমামাহ (রহি.) হাদিস শ্রবণ করেছেন তার মা রুকাইয়াহ (রা:) থেকে। তিনি সেই হাদিস তার মেয়ে হুকাইমাহ (রহি.) এর কাছে বর্ণনা করেছেন। হুকাইমাহ (রহি.) তা বর্ণনা করেছেন তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে।
- উম্মে হুবাবাহ বিনতে হাইয়ান (রহি.) হাদিস শ্রবণ করেছেন উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা:) থেকে। তিনি সেই হাদিস বর্ণনা করেছেন তার ভাই মুকাতিল ইবনে হাইয়ানের কাছে। পরবর্তীতে মুকাতিল ইবনে হাইয়ান তা অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন।
- উম্মে ইয়াহইয়া হুমাইদা (রহি.) হাদিস শ্রবণ করেছেন আপন খালা কাবশাহ বিনতে কা'ব (রা:) থেকে। তিনি সেই হাদিস বর্ণনা করেছেন তার স্বামী ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ (রহি.) ও তার পুত্র ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক (রহি.) এর কাছে।
- হযরত হুকাইমা (রহি.) আয়িশা (রা:) থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। তিনি তা বর্ণনা করেছেন তার মেয়ে উম্মে আসেম (রহি.) এর কাছে।
- হযরত বুররাহ বিনতে রাফে (রহি.) হাদিস শ্রবণ করেছেন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা:) থেকে। তিনি তা বর্ণনা করেছেন তার ভাই আব্দুল্লাহ (রহি.) এর কাছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

বিভিন্ন শাস্ত্রে মুসলিম নারীদের অবদান

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো ইলমের বিভিন্ন শাখা যেমন: হাদিস, ফিকহ, তাজওয়ীদ, ওয়াজ নাসিহাহ ও আধ্যাত্মিক সংশোধনসহ ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্রে মুসলিম নারীদের ইলমী কৃতিত্ব,শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান সম্পর্কে। আমরা আলোচনা করবো জ্ঞানের আরও অন্যান্য শাখা যেমন: কবিতা, সাহিত্য, লিপিকার, মুনশিয়ানাসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান সম্পর্কে।

সেক্ষেত্রে আমাদের শুরুতেই যে বিষয়টি জানা প্রয়োজন তা হলো সাহাবী যুগের পর অর্থ্যাৎ তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও তাদের পরবর্তীদের যুগে কেমন ছিলো নারীদের ইলম অর্জনের পদ্ধতি। তারা মূলত যে কয়টি পদ্ধতিতে ইলম চর্চা করতো তা নিম্নরূপ:

ক. পারিবারিক পর্যায়ে ইলমচর্চা।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ইলমচর্চা।

গ. সফরের মাধ্যমে ইলমচর্চা।

পারিবারিক ইলমচর্চা

এ সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। মুসলিম নারীরা তাদের পরিবারের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ইলমী ব্যক্তিত্ব যেমন: মা,খালা,ফুপু,নানী,পিতা, আপন চাচা, আপন ভাই, আপন মামা, নিজের স্বামী মোটকথা নিজেদের মাহরাম আত্মীয় ও নারীদের মধ্যে যারাই ইলমী কোনো না কোনো শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তাদের থেকেই তারা সে বিষয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করতেন।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ইলমচর্চা

এ পদ্ধতিতে মুসলিম নারীগণ দীর্ঘ সময় ধরে বিজ্ঞ কোনো শায়েখ অথবা শায়েখার তত্ত্বাবধানে থেকে ইলমী শিক্ষা লাভ করতেন। শায়েখদের মাজলিশে ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিলো। যখন শায়েখ তার দারস শুরু করতেন ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও পর্দাসম্মত পরিবেশে তাদের জন্য নির্ধারিত আলাদা পাঠদান কক্ষে অবস্থান করে পর্দার আড়াল থেকে শায়েখের সব কথাই পরিষ্কারভাবে শুনতে পেতেন।

উদাহরণস্বরূপ হযরত উম্মে হানী আবুসিয়্যাহ (রহ.) ও তার বোন ফাতেমা আবুসিয়্যাহ (রহ.) এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা উভয়ই তৎকালীন একটি প্রসিদ্ধ ইলমী পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং একই সাথে ফকীহা ও মুফতীয়া ছিলেন। তাদের সাথে শায়েখ যাওরাক (রহ.) এর দাদি উম্মে বানীন (রহ) ও আরও অনেক আলেমা ও মুহাদ্দিসা মহিলা শায়েখ আবদুস (রহ.) এর হাদিসের দরসে অংশগ্রহণ করতেন এবং কুরাবিয়্যিন শহরের অন্যান্য মাশায়েখদের মতো তার ওখানেও মহিলাদের জন্য আলাদা বসার জায়গা ছিলো। ঐতিহাসিকগণ লিখেন-

‘এই সব সম্মানিতা মহিলাগণ এমন জায়গায় বসে পাঠদান করতেন, যে জায়গা আলাদাভাবে শুধু তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকতো। আর ‘কুরাবিয়্যিন’ শহরে এমন পৃথক ব্যবস্থা অনেক ছিল যেখানে বসে মহিলাগণ বড় বড় শায়েখ ও মুহাদ্দিসদের থেকে সহজেই পাঠ শুনতে পেতেন।’ (নারীর ইলমী অবদান বই: ২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

এসব ঘটনা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে মুসলিম শহরগুলোতে ছাত্রীদের জন্য পৃথক পাঠকক্ষের ব্যবস্থা কত ব্যাপক ছিলো!

সফরের মাধ্যমে ইলমচর্চা:

যেসব শহরে ছাত্রীদের ইলম শিক্ষা করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলোনা বা একটা পর্যায় পর্যন্ত ইলম ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করার পর তারা চেয়েছে মুসলিম বিশ্বের আরও বড় বড় শায়েখ-শায়েখা, মুহাদ্দিস-মুহাদ্দিসাদের থেকে হাদিস,ফিকহ অথবা অন্যান্য বিষয়ে বিশদ জ্ঞানার্জনের এমতাবস্থায় তারা ইলমের জন্য বহু দূর দূরান্তেও সফর করতে পিছপা হতেন না।

ইলমের জন্য সফরকালে তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করেছেন, তার বিধানসমূহকে যথাযথভাবে হেফাজত করেছেন, নারীদের সফরের যেসব শর্ত ইসলামী শরীয়াহ নির্ধারণ করেছে তার প্রত্যেকটি তারা অনুসরণ করেছেন। সফরকালে নিজেদের পর্দা ও নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা, নিজেদের মাহরাম স্বামী,চাচা,মামা,পিতা,পুত্রের সাথে নিয়ে বের হওয়া এসব বিষয়ে তারা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

উম্মে হুসাইন জুদআ (রহি.) ইলমের জন্য নিজের স্বদেশ নিশাপুর ছেড়ে বাগদাদে পাড়ি জমান। সেখানকার বড় বড় মাশায়েখ ও মুহাদ্দিসদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। পরবর্তী তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেন শায়েখ আবুল হাসান মুহাম্মদ বাগদাদী। (তারিখে বাগদাদ: ১৪/৪৪৪)

যাইনাব বিনতে বুরহানুদ্দীন (রহি.) ইব্রাহীম মক্কায় জন্ম নেয়া সত্ত্বেও ইলমের জন্য নিজের চাচার সাথে আরবের বাইরের দেশগুলোতে সফর করেন। বিশ বছর এভাবে জ্ঞানার্জনের পর অবশেষে নিজ ভূমি মক্কায় ফিরে আসেন। (আল ইকদুসসামিন ফী তারীখিল বালাদিল আমীন: ৮/২২৪)

উম্মে আহমাদ ফাতেমা (রহি.) শামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সেখান থেকে মিশর ও তারাবুলুস সফর করেন এবং পরবর্তীতে নিজের চাচা আবুল কাসেম থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। (যাইলুল ইবার: ৮৯, মুজামুশ শুয়ুখ আল কাবীর)

ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (রহি.) উন্দুলুসের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মদ ইশাবলী (রহি.) এর বোন ছিলেন। তিনি তার ভাইয়ের সাথে থেকে ইলম অর্জন করেছেন। অসংখ্য হাদিস তারা দুজন একই শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং উভয়ই হাদিস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেছিলেন। (বুগইয়াতুল মুলতামিস: ৫৩১)

আরেক ফাতিমা বিনতে আবু আব্দুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার পিতা তাকে সঙ্গে করে ইমাম আবু আহমাদ ইবনে আদী (রহি). এর খেদমতে নিয়ে আসতেন। এরপর তারা দুজন বাপ-বেটি ইমাম ইবনে আদী (রহি.) থেকে হাদিস শ্রবণ করতেন। (তারিখে জুরজান: ৪৬৩)

উম্মে মুহাম্মদ যায়নাব (রহি.) এর উপাধি ছিলো 'আল মুআম্মারাতুর রাহেলাহ'। তার স্বদেশভূমি বাইতুল মুকাদ্দাস ছিলো। তিনি বহু দূর দূরান্ত সফর করে ইলম অর্জন ও হাদিস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে তার কাছেও বহু দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা হাদিস অন্বেষণ করতে আসতেন।

(যাইলুল ইবার: ১২৬)

বিশ্বের সকল আহলে ইলমদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলো হারামাইনের সফর। তারা প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমে ও উমরাহর সফরে হারামাইনে আসতেন ইবাদতের পাশাপাশি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে। বড় বড় শায়েখ ও মুহাদ্দিসদের সোহবতে থেকে দীর্ঘ সময় ধরে গভীর জ্ঞান অর্জন করে তারপর দেশে ফিরে যেতেন।

কারীমাহ বিনতে আহমাদ মারওয়াজিয়্যাহ (রহি.) খুরাসানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সারাজীবনের জন্য মক্কায় চলে এসে ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করেন এবং পরবর্তীতে সেখানে হাদিস দারস দেয়া শুরু করেন। তার দারসে বসেই মাত্র পাঁচ দিনে খতীব বাগদাদী (রহ.) বুখারী শরীফ সম্পূর্ণটা তাকে শুনিয়ে শেষ করেন।

হাদিসশাস্ত্রে:

হাদিসশাস্ত্রের ইতিহাসে মুসলিম নারীগণ অনেক বড় বড় অবদান রেখে গেছেন। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও সাহাবিয়্যাদের ইলমী জীবনের বদৌলতে আমরা কত কত হাদিস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা আরও জানতে পেরেছি হাদিস সংকলনে নারী তাবেয়ীগণের অবদানের কারণে কত শত হাদিস আমাদের অবধি পৌছাতে পেরেছে। তাদের ইলমের উত্তরাধিকারিনী হিসেবে পরবর্তীতে অসংখ্য নারীগণের কেউ কেউ হাদিস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেছেন বড় বড় শায়েখদের থেকে, কেউবা অর্জন করেছিলেন নিজেদের শায়েখদের শাগরেদদের মধ্য থেকে সর্বশেষ হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে অনুমতিপ্রাপ্তির খেতাব, কেউবা ছিলেন অনেক বড় বড় উলামা-মুহাদ্দিসগণকে সনদ প্রদানকারিণী।

হাদিসশাস্ত্রে উঁচু সনদ লাভকারীগণ অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। পুরুষ মুহাদ্দিসগণের অনেকে যেমন নিজেদের ইলমী গভীরতা, ইলম অর্জনে চূড়ান্ত নিষ্ঠা-একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই মর্যাদা লাভ করেছেন; তেমনই মুসলিম নারী মুহাদ্দিসগণের অনেকেও এই মর্যাদা লাভের গৌরব অর্জন করে ইতিহাসে নিজেদের সাক্ষর রেখে গেছেন। যেমন ফাতিমা বিনতে দাক্কাক (রহ.) সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেছেন- 'তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীলা ও সম্মানিতা মহিলা ছিলেন এবং উঁচু সনদের অধিকারী ছিলেন। তিনি সে যুগের আবেদা, মহীয়সী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।'

(আল ইবার ফি খবারি মান গবার: ৩/২৬৯)

হাদিসশাস্ত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয় ঐ সকল মুহাদ্দিস ও মুহাদ্দিসাগণ যারা কোনো হাদিস বা কিতাব বর্ণনার ক্ষেত্রে যুগের একমাত্র বর্ণনাকারী হিসেবে বিবেচিত হতেন। অর্থ্যাৎ তাদের ছাড়া সে যুগে আর কেউ সেই হাদিস বা কিতাবটি বর্ণনা করেননি। হাদিস অন্বেষণকারীগণ তাদের সেই অগাধ

যোগ্যতার কারণে বিশেষভাবে তাদের স্মরণাপন্ন হতেন। এমন কয়েকজন মহীয়সী মুহাদ্দিসা হলেন:

- উম্মে আব্দুল্লাহ যায়নাব বিনতে কামালুদ্দীন মাকদিসী (রহি.)
- উম্মে আসমা বিনতে মুহাম্মদ ইবনে সালেম (রহি.)
- আমাতুল হক বিনতে হাফেয আবু আলী হাসান ইবনে মুহাম্মাদ বাকরি (রহি.)
- সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল ওয়াহহাব কুরাইশী (রহি.)
- যায়নাব বিনতে খতীব ইয়াহইয়া ইবনে ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম সুলামী (রহি.)
- যায়নাব বিনতে সুলাইমান ইবনে আহমাদ ইসরইদী (রহি.)
- যায়নাব বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে রযীউদ্দীন (রহি.)
- উম্মে ফযল বিবি বিনতে আব্দুস সামাদ হারসামিয়্যাহ হারাবিয়্যাহ (রহি.)

মুহাদ্দিসাগণের সনদ প্রদান পদ্ধতিঃ মুসলিম মুহাদ্দিসাগণ ছিলেন এই উম্মাহর সবচেয়ে সম্পদের একটি। তারা যেভাবে নিজেরা হাদিসচর্চায় নিজেদের নিমগ্ন রেখে কবুলিয়াতের চূড়ায় পৌছেছিলেন; তেমনই আল্লাহ তায়ালাও উনাদের যোগ্যতার দ্বারা তার দ্বীনের অনেক বড় বড় খেদমত নিয়েছেন। তারা নিজেরা যেমন হাদিসের সনদ লাভ করেছিলেন; তেমনই যেসব নারী ও পুরুষগণ হাদিসশাস্ত্রে ওইরকম যোগ্যতা অর্জন করতেন তাদেরকেও হাদিসের সনদ প্রদান করেতেন। তারা মূলত তিনটি পদ্ধতিতে সনদ প্রদান করতেন-

সামা:

এই পদ্ধতিতে শায়েখ/শায়েখা নিজে হাদিস পাঠ করে তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শোনাতে হয়। মুহাদ্দিসাগণ নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়দের এই পদ্ধততেই দারস প্রদান করতেন।

ক্বিরা'আত:

এই পদ্ধতিতে ছাত্র/ছাত্রী নিজেরা হাদিস পড়ে তাদের শায়েখ/শায়েখা ও উপস্থিত ছাত্রী-ছাত্রীদেরকে শোনায়। মূলত এই পদ্ধতির ব্যবহার করে মুহাদ্দিসাগণ আম মানুষকে হাদিসের দারস দিতেন। প্রথমে তিনি তার কোনো মাহরাম বা নিকটাত্মীয়কে দারসের বিষয়বস্তু ভালোভাবে শেখাতেন। তারপর দারস চলাকালীন সময়ে তার মাহরাম বা নিকটাত্মীয় উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে হাদিস ও দারসের বিষয়বস্তু ভালোভাবে পড়ে শোনাতেন আর শায়েখা (মুহাদ্দিসা) পর্দার আড়ালে থেকে তার পড়া শুনতেন।

ইজাযাহ:

এই পদ্ধতিতে শায়েখ/শায়েখা নিজের সনদের হাদিসগুলো বর্ণনা করার জন্য উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে এই বলে অনুমতি প্রদান করেন যে, 'আমার পক্ষ থেকে এই বর্ণনাগুলো বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হলো।' এই পদ্ধতিতে মুহাদ্দিসাগণ অনেক মুহাদ্দিস ও মুহাদ্দিসাগণকে হাদিস বর্ণনার অনুমতি বা ইজাযাহ প্রদান করেছেন।

ফিকহশাস্ত্রে:

এই উম্মাহর ইলমের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে নারী মুহাদ্দিসের পাশাপাশি অসংখ্য ফকীহা ও মুফতিয়াও জন্ম নিয়েছেন। সাহাবীযুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী শত সহস্র বছর জুড়ে এই ধারাবাহিতা অব্যাহত ছিলো। তারা যেমন প্রসিদ্ধ ছিল নিজেদের ইলম শ্রেষ্ঠত্ব গুণে, তেমনই তাদের ফাতওয়াও এই উম্মাহ গ্রহণ করেছে পূর্ণ আস্থার সাথে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহি.) এর মতে শুধুমাত্র সাহাবীযুগেই যে একশো পঁচিশ জন সাহাবীর ফাতওয়া সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে ২২ জনই ছিলেন ফাতওয়া প্রদানকারিনী নারী সাহাবী।

আয়িশা (রা:) ছিলেন তাদের মধ্যে ফকীহুল উম্মাহ অর্থ্যাৎ উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ। আয়েশা রা.-কে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাতজনের একজন গণ্য করা হয়। ইমাম যাহাবীর মতে তিনি সকল যুগের সেরা নারী ফকীহ। আবু বকর (রা), উমর (রা:) ও

উসমান (রা:) এর খেলাফতের সময় তিনি ফতোয়া দিতেন। তারা বিভিন্ন বিষয় তার নিকট চিঠি দিয়ে পরামর্শ নিতেন।

আয়েশা রা. শুধু ফতোয়া ও হাদীস বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং বিভিন্ন সাহাবীর সাথে ইলমি আলোচনা করেছেন। তাদের দেয়া বিভিন্ন ফতোয়ার ওপর সংশোধনী দিয়েছেন। তিনি এমন অনেক ফতোয়া দিয়েছেন, যা শুধু তার মাধ্যমেই প্রমাণিত। তার হাত ধরেই পরবর্তীতে ফতোয়া প্রদানের যোগ্য নারী ইসলামে অবদান রেখেছেন। যেমন- আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান, যিনি তার পরে ফতোয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। সাফিয়্যাহ বিনতে শায়বাহ ও উম্মে দারদা।

তাবেয়ীদের যুগে মদিনার প্রসিদ্ধ সাত আলেমের প্রত্যেকেই নারীদের থেকে ইলম শিক্ষা করেছেন। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব আয়েশা (রা:) থেকে, উরওয়া তার মা আসমা (রা:) ও খালা আয়েশা (রা:)থেকে, কাসিম তার ফুফু আয়েশা (রা:) থেকে এবং উবায়দুল্লাহ আয়েশা (রা:) থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন।

যায়নাব বিনতে আবু সালামাহ (রা:) এর তাফাক্কুহ এতো উচ্চস্তরের ছিলো যে বিখ্যাত তাবেয়ী আবু রাফে (রহি.) যখনই মদীনা মুনাওয়ারার কোনো ফকিহের কথা স্মরণ করতেন তখন যায়নাব বিনতে আবু সালামাহ (রা:) এর কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করতেন।

ইমাম মালেক রহ. আয়েশা বিনতে সাআদ রা. থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া ইমাম রহ. এর এক মেয়ে ফাতেমা তার ইলম সংরক্ষণ করতেন। তিনি দরজার পেছনে দাঁড়ানো থাকতেন। ইমাম মালেক রহ. এর কোন ছাত্র ভুল করলে তিনি দরজা নক করতেন এবং ইমাম মালেক রহ. তা সংশোধন করে দিতেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. মূলত একজন নারীর প্রশ্নের কারণেই ফিকাহ শাস্ত্রে অগ্রসর হন।

পরবর্তী পাচঁশত শতাব্দীর খতীবে বাগদাদীর মতো মানুষ নারী মুহাদ্দিস ও ফকীহ তাহেরা বিনতে আহমাদ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। ইমাম ইবনু আসাকির (৫৭১), হাফেজ সিলাফী (৫৭৬) ও ইমাম যাহাবী প্রত্যেকেই তাদের নারী শায়েখদের উল্লেখ কথা উল্লেখ করেছেন।

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে তিউনিসিয়ার কারওয়াইনের বিখ্যাত দুই জন নারী আলেম ছিলেন। আসমা বিনতে আসাদ (২৫০); তিনি ইলমি বিভিন্ন বিতর্কে অংশ নিতেন। তার প্রশ্নোত্তর মজলিস অনুষ্ঠিত হত। তার পিতা মালিকি মাযহাবের বড় ইমাম হওয়া সত্বেও তিনি ফিকহে হানাফি অনুসরণ করতেন। দ্বিতীয়জন মালিকি মাযহাবের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ইমাম সুহনুনের মেয়ে খাদিজা (২৭০)।

ঠিক একই সময়ে মিসরে ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের পুরোধা ইমাম মুযানীর বোন (২৬৪); যিনি শুধু মুযানীর বোন নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ইমাম শাফেয়ি থেকে ইলম অর্জন করেন। খোদ মুযানীর সাথেও বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক করতেন।

অন্যদিকে কাজি আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনে ইসমাঈল মাহামালী (রহি.) এর কন্যা আমাতুল ওয়াহেদ সিত্তিয়্যাহ (রহি.) এর পিতা, ইসমাইল ইবনে আব্বাস, ওয়াররাক আব্দুল গাফফার, আবুল হাসান মিসরী, হামযাহ হাশেমীসহ আরও অনেকের কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত নেক ও ফাজেলা নারী ছিলেন। তিনি মিরাস, হিসাববিজ্ঞান, নাহু এবং আরও অনেক বিষয়ে দক্ষতা রাখতেন। এছাড়াও তার একটি বিশেষ গুণ ছিলো। তা হলো কুর'আন, ফিকহী মাসায়েল, ইলমে নাহু, ফারায়েয ও আরও বিভিন্ন ফন তার মুখস্থ ছিলো। ফিকহে শাফেয়ীর উপর তার বিশেষ জ্ঞান ছিলো।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহি) লিখেছেন- 'তিনি অনেক বড় আলেমা, ফাযেলা ছিলেন এবং ফিকহে শাফেয়ীর বড় একজন হাফেযা ছিলেন। অর্থ্যাৎ সেই সময়ে ফিকহে শাফেয়ী সম্পর্কে বিনতে মাহামালীর চেয়ে বেশি জানাশোনা তেমন কারো ছিলোনা।

আন্দালুসে ফাতেমা বিনতে ইয়াহইয়াহ (৩১৯) আলেম, ফকীহ ও মুত্তাকী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার জানাযায় যত মানুষ অংশ নিয়েছিল, কোন নারীর জানাযায় এমন দেখা যায়নি।

ইরাকে উম্মে ঈসা (৩২৮) ফতোয়া প্রদান করতেন। কাযী হুসাইনের মেয়ে (৩৭৭) শাফেয়ি মাযহাবের পাণ্ডিতব অর্জন করে পিতার সাথে ফতোয়ার কাজ করতেন। খোরাসানে আয়েশা বিনতে আহমাদ (৫২৯) ফিকহের চর্চা করতেন। ফতোয়া দিতেন।

একই শতাব্দীতে ইরাকে শাহদাহ বিনতে আহমাদ (৫৭৪) উলুমে ইসলামিয়াতে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষত ফিকহে। তিনি পর্দার ওপাশ থেকে নারীদের পাঠদান করতেন। তার নিকট অনেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তুহফাতুল ফুকাহার লেখক হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও আলেম শায়েখ আলাউদ্দিন সমরকন্দীর (ওফাত: ৫৩৯ হি.) কন্যা ফাতিমা ছিলেন একজন বড় মাপের ফকীহা। তার স্বামী ছিলেন আলাউদ্দিন কাসানী। তিনি তুহফাতুল ফুকাহার একটি ব্যাখাগ্রন্থ লিখেছেন আল বাদাইউস সানাইউ নামে। ফাতেমা (রহি.) সম্পর্কে কিতাবে আছে যে, এই ব্যাখাগ্রন্থ লেখার সময় কোথাও যদি স্বামীর ভুল হয়ে যেতো তাহলে ফাতিমা (রহি.) সংশোধন করে দিতেন। তিনি পিতা ও স্বামীর সাথে ফাতওয়া লেখার কাজও করতেন। এ সম্পর্কে কিতাবে আছে,'বিভিন্ন ফাতওয়ার উপর ফাতিমা, তার পিতা ও তার স্বামী তিনজনেরই সাক্ষর থাকতো'।

হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে ছিলেন যায়নাব বিনতে আবুল কাসিম। তিনি তাফসীরে কাশশাফের রচয়িতা যামাখশারীসহ অনেক আলেম থেকে ইলম অর্জন করেন। আর তার নিকট ঐতিহাসিক খাল্লিকানসহ তৎকালীন অনেক বড় আলেমগণ ইজাযাত গ্রহণ করেন।

ইমাম নাজমুদ্দিন ইবনে ফাহাদ (৮৮৫) ১৩০ জন নারী থেকে ইলম অর্জন করেছেন। ইবনু হাজার (৮৫২) তার কিতাবে হিজরি অষ্টম শতাব্দীর ১৭০ জন নারী শায়েখের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে ৫৪ জন থেকে তিনি বর্ণনা করেন। ইবনু হাজারের ছাত্র সাখাবী (৯০২) ৮৫ জন নারী থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তার সমসাময়িক সুয়ূতি (৯১১) ৪৪ জন নারী শায়েখ থেকে ইলম অর্জন করেছেন।

মোটকথা সপ্তম ও হিজরি অষ্টম শতাব্দীর ইবনু হাজার ও যাহাবীসহ অন্যান্য যাদেরকে দিয়ে যুগের উদাহরণ দেয়া হয়, তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন নারী হতে হাদীস ও ফিকহের ইলম গ্রহণ করেছেন।

হিজরি দশম শতাব্দীতে কায়রোর বুকে উম্মে আব্দুল ওয়াহাব জ্ঞানের আলো বিতরন করেন। তিনি তৎকালীন বড় বড় আলিমদের থেকে ফতোয়া ও শিক্ষাদানের অনুমতি লাভ করেন।

হিজরি একাদশ শতাব্দীতে মক্কাতে আমরা পাই কুরাইশ বিনতে আব্দুল কাদিরকে (১১০৭)। তিনি বড় আলেম পরিবারের সদস্য হওয়ার পাশাপাশি তিনি বড় মাপের ফকীহ ছিলেন। বাড়িতে তার নিকট হাদীসের কিতাব মানুষ পড়তো। এমনকি একাদশ শতাব্দীতে মক্কায় যে সাত হিজাযি সনদ খ্যাতি লাভ করে, তার এক সনদের মূল তাকে গণ্য করা হয়।

ফিকহের ক্ষেত্রে নারীদের এমন লক্ষ্যণীয় উপস্থিতি সত্বেও ফিকহের কিতাবে উম্মাহাতুল মুমিনীন ছাড়া অন্যদের মতামত পাওয়াই যায় না। তবে এর কিছু কারণ রয়েছে। সাধারণত ফুকাহায়ে কেরাম তাদের কিতাবে প্রসিদ্ধ মতই আনেন। আবার নারী ফকীহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, হয়তো তার পিতা কিংবা স্বামী বড় আলেম হয়। ফলে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট আলাদা করে আর সামনে আসে না। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের নারীরা নিজেদের অন্দরমহলে রাখতেই অধিক পছন্দ করতেন বিধায় উম্মাহকে তারা উপকৃত করে গেছেন ঠিকই কিন্তু তা নিজেদের অন্তরালে রেখে।

তাজওয়ীদ ও কেরাতশাস্ত্রে:

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরীনের সহোদরা ছিলেন হাফসা বিনতে সিরীন (রহি.)। তিনি অনেক বড় আলেমা ছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সেই সম্পূর্ণ কুর'আনুল কারীম অর্থ ও ব্যাখাসহ মুখস্থ করার পাশাপাশি তাজবীদ ও কেরাত শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। ইমাম ইবনে সিরীন (রহি.) পর্যন্ত ইলমুল ক্বেরাত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে যখনই সংশয়ে পড়তেন তার থেকে জিজ্ঞেস করে নিতেন। কেউ ইলমুত তাজওয়ীদ সংশ্লিষ্ট সমস্যা

নিয়ে এলে বলতেন, 'যাও হাফসাকে জিজ্ঞেস করে এসো সে এটা কিভাবে পড়ে?' (সিফাতুস সফওয়াহ: ৪/১৬)

ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদিসী (রহি.) এর স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুহাম্মাদ (রহি.) ইলমুত তাজওয়ীদ ও ইলমুল কিরাআতে পারদর্শী ছিলেন। সেইসাথে তিনি ছিলেন কুর'আনের আলিমাহ। উলূমে কুর'আনের উপর সুগভীর ইলমের কারণে তিনি মাশহুর ছিলেন। (হাশিয়াতুল ইকমাল: ১/৯২)

মাইমুনা বিনতে জাফর (রহি.) তার পিতা থেকে তাজওয়ীদ ও ক্বিরাতের ইলম অর্জন করেন। উভয়শাস্ত্রেই তিনি পারদর্শী,বিশেষজ্ঞ ও গভীর জ্ঞান রাখতেন। পরবর্তীতে এই জ্ঞান তিনি অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। (তাবাকাতুল হানাবেলাহ)

ইমামুল কুররা ইবনুল জাযারী (রহি.) নিজ কন্যা সম্পর্কে লিখেছেন,'সে সাত ক্বিরা'আতে কুরআনুল কারীম মুখস্থ শুনিয়েছে। দশ ক্বিরা'আত সম্পর্কেও যথেষ্ট ইলম ছিলো। ইলমুত তাজওয়ীদ সম্পর্কে এই পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলো যে, সেইসময় কোনো ক্বারী বা তাজওয়ীদ বিশারদ পর্যন্ত তার সমপর্যায়ে পৌছাতে পারেনি।

এছাড়াও ইসলামের শুরুর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেই নারীরা অধিক পরিমাণে কুরআনুল কারীম হিফজ করেছে, ইলমুত তাজওয়ীদের জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ করেছে এবং সন্তানদেরকে কুর'আনের সাথে যাত্রার ও মুখস্থকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় নারীদের অবদান:

পূর্বের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠদান পদ্ধতি ছিলো নির্দিষ্ট কোন শায়েখের দারসে দীর্ঘদিন অংশগ্রহণের মাধ্যমে তালিবে ইলমগণ বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর শিক্ষা লাভ করতেন। কিন্তু যখন পাঠদান পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলো অর্থ্যাৎ একাধিক শায়েখের তত্ত্বাবধানে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ অধ্যয়নের প্রক্রিয়া শুরু হলো; তখন খলিফা, আমির থেকে শুরু করে রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আলিমগণ দ্বারা অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু হলো। এ পর্যায়ে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও নিজেদের ধনসম্পদ খরচ করে ইলম প্রচারের উদ্দেশ্যে নানাবিধ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অংশ নেন।

সুলতান সালাহউদ্দীন (রহি.) এর বোন রবীয়া খাতুন মাকামে জাবালে মাদ্রাসা নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার আশি বছরের হায়াতের সময়কালে মাদ্রাসার উন্নয়নকল্পে অবদান রাখেন। ৬৪৩ হিজরীতে এই মাদ্রাসা প্রাঙণেই তাকে সমাহিত করা হয়। (আল ইবার ফী খবারি মান গবার: ৫/৩৭৫)

খাতুন উম্মে সালেহের নামে দিমাশকে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে মাদ্রাসায় ইলমে তাজবীদ ও ইলমে কেরাতের বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা হতো। এ মাদ্রাসায় যে বিষয়ে যিনি পারদর্শী ছিলেন তাকে ওই বিষয়ের শিক্ষকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো। (আল ইবার ফী খবারি মান গবার: ৫/৩৭৫)

খলিফা আল মুস্তাজি বিআমরিল্লাহর আজাদকৃত দাসী তাবুজ্জামান হাবশিয়্যাহ (রহি.) মক্কা মুকাররমায় ফিকহে শাফেয়ীর উপর তালীমের জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ওয়াকফ করেন। যেটি দারুল আরকামের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। (আল ইকদুসসামিন ফী তারিখিল বালাদিল আমীন: ১/১১৭)

বাদশাহ আশরাফ মুসার স্ত্রী তুরকান বিনতে মালিক শামের মাকামে জাবালে নিজ নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পর এই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণেই তাকে দাফন করা হয়। (আল ইবার ফী খবারি মান গবার: ৫/১৬৪)

এছাড়াও বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অংশের নারীরা ইলমের প্রচার প্রসারে নিজেদের সম্পদ ব্যায়ের মাধ্যমে অংশ নেয়া শুরু করেন। যেমন:

দামেস্ক: দামেস্ক ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জৌলুসপূর্ণ ও আলোকদীপ্ত শহর। ক্ষমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা সব দিক থেকেই তা ছিল মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। দামেস্কে বহু নারী পণ্ডিত, ফকিহ, হাদিসবিশারদ ও কবির আগমন ঘটে।

নারীরা এখানে শুধু ৫২৬ থেকে ৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৯টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন ১. মাদরাসাতুল খাতুনিয়্যা বারানিয়্যা, ২. মাদরাসাতুল খাতুনিয়্যা জাওয়ানিয়্যা, ৩. মাদরাসাতুল কুতবিয়্যা, ৪. মাদরাসাতুশ শামিয়্যা বারানিয়্যা, ৫. আল মাদরাসাতুল আজরাবিয়্যা, ৬. আল মাদরাসাতুল মারিদিনিয়্যা, ৭. আল মাদরাসাতুল ফররুখ শাহিয়্যা, ৮. আল মাদরাসাতুশ শামিয়্যা আল জাওয়ানিয়্যা, ৯. মাদরাসাতুস সাহিবাহ, ১০. আল মাদরাসাতুল মাইতুরিয়্যা, ১১. আল মাদরাসাতুল কামিলিয়্যা, ১২. আল মাদরাসাতুদ দিমাগিয়্যা, ১৩. আল মাদরাসাতুল আতাবিকিয়্যা, ১৪. মাদরাসাতুল আলিমা, ১৫. আল মাদরাসাতুল হাফিজিয়্যা, ১৬. আল মাদরাসাতুল মুরশিদিয়্যা, ১৭. আল মাদরাসাতুল আদিলিয়্যা আস-সুগরা, ১৮. আল মাদরাসাতুশ শোমানিয়্যা, ১৯. আল মাদরাসাতুল জামালিয়্যা।

হালব: হালব ইরাকের একটি প্রাচীন নগরী। ইসলামী শাসন আমলে এটি ছিল অত্র অঞ্চলের অন্যতম প্রধান জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ইসলামের সোনালি অধ্যায়ে হালবে দুই শতাধিক মাদরাসা, খানকা, রিবাত (সুফিধারার আবাসিক বিদ্যালয়) ও ঝাবিয়্যা (অস্থায়ী জ্ঞানের মজলিস) প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকটিই ছিল নারীদের প্রতিষ্ঠিত। যেমন আল ফিরদাউস কমপ্লেক্স। যার অধীনে একটি মাদরাসা, একটি মসজিদ, একটি রিবাত, একটি ঝাবিয়্যা, একটি তুরবা (যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের প্রায়োগিক ব্যবহার শেখানো হতো) ছিল। কমপ্লেক্সটি প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান জাহির গাজি বিন সালাহুদ্দিনের স্ত্রী রানি দাইফা খাতুন। আল মাদরাসাতুল কামিলিয়্যা হালবে নারীদের প্রতিষ্ঠিত আরেকটি বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান কামিলের কন্যা এবং

সুলতান আজিজ মুহাম্মদের স্ত্রী ফাতিমা খাতুন। রহমা কাজিন বিনতে আবদুল কাদির প্রতিষ্ঠা করেন আল মাদরাসাতুর রহিমিয়্যাহ।

মার্ভ: মধ্য এশিয়ার মার্ভ শহরে 'আল মাদরাসাতুল খাতুনিয়্যা' নামে একটি বড় মাদরাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন আইয়ুবীয় বংশের একজন অভিজাত নারী।

ত্রিপোলি: আধুনিক লিবিয়ার ত্রিপোলিতে দামেস্কের প্রশাসক ইজ্জুদ্দিনের স্ত্রী আরগুন খাতুন 'আল মাদরাসাতুল খাতুনিয়্যা' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ফিলিস্তিন: ফিলিস্তিনে নারীদের প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য মাদরাসা হলো 'আল মাদরাসাতুল বারুদিয়্যা', 'আল মাদরাসাতুল উসমানিয়্যা' ও 'আল মাদরাসাতুল খাতুনিয়্যা'।

দিল্লি ও ভারতবর্ষ: ভারতবর্ষে ভূপালের রানি শাহজাহান বেগম একাধিক মাদরাসা, মসজিদ ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানা রাজিয়া দিল্লি ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শতাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

ইয়েমেন: প্রাচীনকালে ইয়েমেনে নারীদের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার সংখ্যা ৩৩টি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো সালেহিয়্যা, সাবেকিয়্যা, শাসসিয়্যা, মু'তাবিয়্যা, ইয়াকুতিয়্যা, নাজমিয়্যা, জাহরিয়্যা, হাদারিয়্যা, আয়েশিয়্যা, ওয়াসিকিয়্যা ইত্যাদি।

মিসর: মিসরেও নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় অবদান রাখেন। তারা অসংখ্য মাদরাসা, খানকা, ঝাবিয়্যা ও রিবাত প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রত্যেকটিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হতো। মিসরে নারীদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মাদরাসা হলো কুতবিয়্যা, হিজাজিয়্যা, আশুরিয়্যা, আস-সগিরা আস-সুন্নিয়্যা, আন-নাহদা, বানাতুল আশরাফ ও আল ইহসান।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব:

ইতোপূর্বে বিভিন্ন আলোচনায় হয়তো একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে আমরা দেখেছি ইলমী শ্রেষ্ঠত্বের আসনে পৌছা নারী ওস্তাযগণ থেকে অনেক মুহাদ্দিস,ফকীহ ও আলিমগণই ইলমগ্রহণ করেছেন। যদিও বিজ্ঞ নারী আলিমাগণের ইলম প্রদানের সুরত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তারপরও প্রশ্ন উঠতে পারে **'বর্তমান যুগেও কি বিজ্ঞ নারী আলিমাগণ গাইরে মাহরাম পুরুষদের পর্দার আড়াল থেকে দারস দিতে পারবে?'**

এর জবাব হচ্ছে **'না।'**

কারণ-

১) **বর্তমান যুগে পুরুষদের দারস প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগ্য পুরুষ মুফতি, মুহাদ্দিস ও আলিম ওস্তাযগণ রয়েছেন।** বরং বর্তমানে নারীদেরকে যোগ্য আলিমাহ, মুফতিয়া ও মুহাদ্দিসা হিসেবে তৈরীতে অধিক পরিমাণে মনোযোগী হওয়া উচিত।

২) **বর্তমান যুগ ফিতনার যুগ। বর্তমান যুগের ফিতনা আগের যুগের ফিতনার চেয়েও অনেকবেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী।** সুতরাং তাকওয়ারপূর্ণ অবস্থান এটাই **'নারীদেরকে যোগ্য নারী ওস্তাযাহ দ্বারা পাঠদান করা** এবং **পুরুষ আলিমগণ নিজের মাহরাম নারীদেরকে যোগ্যতাবান আলিমাহ, মুফতিয়া ও মুহাদ্দিসা হিসেবে তৈরীতে সময় দিবেন ও মেহনত করবেন। যেন তারা যোগ্যতাবান নারী আলিমাহ, মুফতিয়া, মুহাদ্দিসা হয়ে উম্মাহর নারীদের জন্য বেশি বেশি যোগ্যতাবান নারী আলিমাহ, মুফতিয়া ও মুহাদ্দিসা তৈরীতে মেহনত করতে পারেন।**

তৃতীয় অধ্যায়

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

উম্মাহর কিংবদন্তী বিনির্মাণে মায়েরা:

‘উম্মাহর নারীগণই ইকবালের প্রত্যাশার জায়গা। এই ফিতনার যুগে তারাই পারেন জাতির সম্পদকে নিরাপদ রাখতে এবং প্রজন্মের মাঝে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনা-বিস্তারের মাধ্যমে উম্মাহর ঐক্যের ভূমি সুজলা-সুফলা রাখতে। তারা যেন যুগের অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতন হন এবং আপন সন্তানকে সঠিক তালীম-তরবিয়তের দ্বারা যমানার রাহাজানি থেকে আগলে রাখেন।’

কত সুন্দর নাসিহাহই না আল্লাহ ইকবাল (রহি.) করে গেছেন এই জাতির নারীদের কেন্দ্র করে। তার এই চেতনাকে নিজেদের ভেতর শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধারণ করেই মুসলিম মায়েরা জন্ম দিয়ে গেছেন উম্মাহর কিংবদন্তীদের। গড়ে তুলেছেন তাদেরকে নিজেদের নিখাদ যত্নে, পরম আত্মত্যাগে ও সুনিপুণ তারবিয়ায়। এখন আমরা এমনই কিছু উম্মাহর কিংবদন্তী মায়েদের ব্যাপারে জানবো।

ইমাম মালিকের (রহি.) মা:

ইমাম মালিকের মায়ের নাম ছিলো হযরত আলিয়া বিনতে আব্দুর রহমান (রহি.)। ইমাম মালিক যখন ছোট ছিলেন তিনি তার ইলম অর্জনের জন্য তৎকালীন আলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইমাম রবিয়াতুর রায়ের মাজলিশকে নির্বাচন করেছেন। তারপর পুত্র মালিককে আলেমদের পোশাক টুপি ও পাগড়ী পড়িয়ে দিয়ে তাকে এই বলে প্রথমবারের মতো দারসে পাঠান যে,'রবীয়াতুর রায়ের মাজলিশে যাও এবং প্রথমে তার কাছ থেকে আদব, শিষ্টাচার ও আখলাক শিক্ষা করো। অতঃপর ইলম অর্জন করো।' (তারতীবুল মাদারেক ওয়া তাকরীবুল মাসালেক: ১/১৩০)

ইমাম শাফেয়ীর (রহি.) মাঃ

ইমাম শাফেয়ীর মায়ের নাম ছিলো ফাতিমা বিনতে আব্দুল্লাহ। তার মা তাকে ইলম অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় নিয়ে যান। কিন্তু তার মায়ের কাছে যথেষ্ট অর্থকড়ি না থাকায় তিনি তাকে মক্তবে ভর্তি করাতে পারছিলেন না। অবশেষে ওস্তায তাকে বিনামূল্যে মক্তবে পড়াতে রাজি হোন এই শর্তে যে তিনি যখন মাদ্রাসায় থাকবেন না তখন ইমাম শাফেয়ী বাচ্চাদের সবক পড়িয়ে দিবেন। তার মায়ের কাছে এই পরিমাণ অর্থ ছিলোনা যে তিনি নিজের সন্তানকে লেখালেখি করার জন্য খাতা কলম কিনে দিতে পারবেন। তাই ইমাম শাফেয়ী বেশি বেশি উলামা ও মুহাদ্দিসদের দারসে উপস্থিত হয়ে হাদিস ও মাসায়েল মুখস্থ করতেন। অত:পর লেখার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে গাছের বাকল, হাড্ডি, মাটির ভাঙা পাত্রের টুকরো কুড়িয়ে সেগুলোতে লেখার চর্চা করতেন। যখন ইমাম শাফেয়ীর ইলম অর্জনের জন্য সফরে যাওয়ার প্রয়োজন হতো তার মা নিজের জামাকাপড় থেকে শুরু করে সকলপ্রকার দরকারি জিনিসপত্র অন্যের কাছে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে ছেলেকে ইলম অর্জনের জন্য পাঠাতেন। (মুখতাসার সাওয়ানেহে আইম্মায়ে আরবাআ)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের (রহি.) মাঃ

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মায়ের নাম সাফিয়্যাহ বিনতে মাইমুনাহ (রহি.)। ছোটবেলায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের জন্মের মাত্র তিন বছর বয়সে তার বাবা মারা যান। তারপর যতদিন তার মা বেঁচে ছিলেন তিনিই আহমাদ ইবনে হাম্বলের দেখাশোনা করেন।

তিনি সন্তানের উত্তম তারবিয়ার ব্যাপারে এতো সচেতন ছিলেন যে অনেক ধর্নাঢ্য পরিবারের পিতা-মাতারাও বালক আহমাদের উত্তম চরিত্র, উন্নত শিক্ষাদীক্ষা ও মান-মর্যাদা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতেন এই ভেবে যে 'কিভাবে একজন বিধবা স্বামীহীনা মহিলা সন্তানকে এতো চমৎকার তারবিয়াহ দিয়ে গড়ে তুলতে পারে!'

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উনাইনাহর (রহি.) মাঃ

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উনাইনাহর ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে ইমাম শাফেয়ীর এই উক্তিটিই যথেষ্ট যে তিনি বলেছেন, 'ইমাম সুফিয়ান ইবনে উনাইনাহ ও ইমাম মালিক না থাকলে হিজায থেকে ইলম বিদায় হয়ে যেতো'। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে পৌছানোর পেছনে রয়েছে তার মায়ের নিরবচ্ছিন্ন নিরলস প্রচেষ্টা। তার মায়ের তাকে উদ্দেশ্য করা একটি উপদেশ ছিলো এমন-

'হে আমার পুত্র! তুমি ইলমেদীন অর্জনে নিমগ্ন থাকো। কাপড় বুনে তোমার যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে আমিই যথেষ্ট। হে আমার পুত্র! তুমি দশটি হাদিস শিক্ষা করে নিজেকে যাচাই করে দেখ যে, তোমার চালচলন, আদব-আখলাক, মন-মেজাজ ও চিন্তা-চেতনায় কোনো পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে কিনা? যদি দেখো যে কোনো উন্নতি হয়নি, তাহলে ধরে নিবে এই শিক্ষা তোমার কোনো কাজেই আসলোনা। না উপকার করলো আর না ক্ষতি করলো।' (তারীখে জুরজান: ৪৪৯)

যে মা তার সন্তানের ইলম অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে ইলমের প্রকৃত হাকিকত অর্জনের প্রতি এতোটা মনোযোগী হতে পারে ; যিনি সন্তানকে এমন উত্তম তারবিয়াহ দিতে পারেন কি করে এটা সম্ভব যে তার সন্তান বড় কিছু হবেনা? এই সুফিয়ান ইবনে উনাইনাহ প্রায় আশিজন তাবেয়ী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী নিজেই অনেক উচ্চ মর্যাদায় পৌছান। তিনি নিজের ছোটবেলায় বড়দের মজলিশে ইলম অর্জনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এভাবে বলেছেন,"আমি যখন শহরের বড় বড় আলিমদের মাজলিশে উপস্থিত হতাম; মাজলিশের লোকজন আমাকে দেখে বলতো 'এই ছোট হুজুরকে বসার জায়গা করে দাও!'" (আল কিফায়াহ: ৬০-৬১)

ইমাম বুখারীর (রহি.) মা:

ইমাম বুখারি শৈশবেই বাবাকে হারান। তাঁর মা ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু ও দ্বীনদার। একইসাথে সন্তানের ইলম অর্জনের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী। শৈশবেই তিনি সন্তানের হৃদয়ে ইলমের জন্য ভালোবাসা তৈরী করে দিয়েছিলেন। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রথম হাদিসের দারসে উপস্থিত হোন এবং সেই ছোট্ট বয়সেই হাদিসের কিতাব মুখস্থ শুরু করেন। এভাবে একসময় তিনি ৭০ হাজার হাদিস মুখস্থ করে ফেলেন। তার ওইসময়কার ইলম সম্পর্কে সালিম ইবনে মুজাহিদ (রহি.) বলেন- "আমি একদিন মুহাম্মাদ ইবনে সালিম (রহি.) দারসে একটু দেরিতে উপস্থিত হই। তিনি তখন আমাকে বলেন 'তুমি আরেকটু আগে এলে একটি ছোট্ট বালককে দেখতে পেতে, যে এইটুকু বয়সেই ৭০ হাজার হাদিস মুখস্ত করে ফেলেছে।' (ত্ববাকাশ শাফেইয়্যাতিল কুবরা: ২/২১৮)

এরপর ১৮ বছর বয়সে তিনি সাহাবা, তাবেয়ীদের জীবনি ও বাণীসমূহ সংকলন শুরু করেন। আর তারপর মসজিদুল নববীতে নবীজীর রওজার সামনে বসে রাত্রিবেলায় চাঁদের আলোয় সেগুলো লিখতেন। (তারিখে বাগদাদ: ২/৩)

শৈশবে যখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন তাঁর মহীয়সী মায়ের আল্লাহর কাছে অনবরত দোয়ার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। তিনি ইলমের জন্য পুত্রের দৃষ্টিশক্তি চেয়েছিলেন আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহ তার ওই দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে দ্বীনের এমন খিদমত নিয়েছেন যে আজও মানুষ তাকে 'আমিরুল মু'মিনীন ফীল হাদিসের' নজরে ভূষিত করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রহি.) মা:

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ইসলামী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম। মায়ের নিবিড় পরিচর্যা ও নির্দেশনায় ইতিহাসের পাতায় তিনি চিরস্মরণীয়। ইতিহাসে তিনি শায়খুল ইসলাম নামে পরিচিত। সিত্তুন নাইম বিনতে আবদুর রহমান ছিলেন তাঁর মা। মা তাঁকে এক চিঠিতে লেখেন, ‘ইসলাম ও মুসলিমদের সেবার জন্য আমি তোমাকে তিলে তিলে গড়েছি। তোমাকে দ্বিন শিক্ষা দিয়েছি। আমার কাছে থাকার চেয়ে তুমি দেশ-বিদেশে সফর করে ইসলাম ও মুসলিমের সেবা করো। এটাই আমার কামনা। তুমি দ্বিনের সেবা করলে তোমার প্রতি আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। কিন্তু তুমি ইসলাম ও মুসলিমদের সেবা না করলে আল্লাহর কাছে আমি তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব।’

মুহাম্মাদ আল ফাতিহের (রহি.) মা:

মুহাম্মদ আল ফাতিহ (রহ.) কনস্টান্টিনোপলের বিজেতা। রাসুল (সা.)-এর সুসংবাদপ্রাপ্ত সেনাপতি। শৈশবে ফজরের সময় মা তাঁকে ঘুম থেকে তুলে কনস্টান্টিনোপলের দেয়াল দেখিয়ে বলতেন, হে মুহাম্মদ! একদিন তুমি এই অঞ্চল জয় করবে। রাসুল (সা.) তোমার সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। তুমিই হবে রাসুল (সা.)-এর সুসংবাদপ্রাপ্ত আমির। তখন তিনি প্রশ্ন করেন, এত বড় অঞ্চল কিভাবে আমি জয় করব? তার মা উত্তরে বলেন, কোরআন, ক্ষমতা, অস্ত্র এবং মানুষের ভালোবাসা দিয়ে তা জয় করবে। মা তাঁকে শুধু আশা দেখিয়ে থেমে যাননি, বরং তাঁকে যোগ্যতর করে গড়ে তুলেছেন। অন্তরে রোপণ করেছেন কোরআন ও মানবতার ভালোবাসা। তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ধৈর্য ও অবিচলতা।

ইমাম যায়নুদ্দীন দিমাশকীর (রহি.) মা:

ইমাম যায়নুদ্দীন দিমাশকীর মা ছিলেন অত্যন্ত নেককার, আলেমা, কুর'আনের হাফেযা ও মুফাসসির। তিনি নিজ স্বামীর লেখা ত্রিশ খন্ডের কিতাব 'তাফসিরে জাওয়াহের' সম্পূর্ণটুকু মুখস্ত করেছিলেন। নিজে যেমন প্রাজ্ঞ আলিমাহ ছিলেন তেমনই নিজের ঔরশজাত সন্তান যায়নুদ্দীন দিমাশকীকেও আলিম হিসেবে তৈরীর পেছনে নিজের জীবনের সবটুকুকে ব্যয় করেছেন। যখন তার ছেলে তাফসিরের দারস থেকে বাড়ি ফিরতো তিনি নিজ ছেলেকে কাছে বসিয়ে জানতেন করতেন আজ কি পড়েছে। তারপর ছেলের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেসবের উত্তর দিতেন, ছেলেকে কোনো নাসিহাহ করার হলে তাও করতেন, এরপর পরম মমতায় তার জন্য দুয়া করতেন।

বলা হয়ে থাকে যে মায়ের এই নিত্যকার দুয়া ও তারবিয়াহর কারণেই তিনি সে যুগের অনেক বড় একজন ফকীহ, মুফাসসির ও প্রকৃত বক্তা হতে পেরেছিলেন।

বদিউজ্জামান সাইয়্যিদ নুরসির (রহি.) মা:

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সংস্কারক বদিউজ্জমান সাইদ নুরসি। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁর মায়ের অবদান ছিল। মায়ের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'তাঁর মা কখনো সন্তানকে অজু ছাড়া দুধ পান করাতেন না।' নুরসি বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি মায়ের কাছে জীবনের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করি। তা আমার হৃদয়জুড়ে গেঁথে আছে। চিন্তার প্রতিটি শাখায় মিশে আছে আমার মায়ের দেওয়া শিক্ষা। ৮০ বছর বয়সে জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও মায়ের শিক্ষা আমাকে পথ দেখায়।'

ইমাম আওকাসের (রহি.) মা:

কাজিয়ে মক্কা মোহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল আওকাস (রহি.) দেখতে খুবই অদ্ভুত গড়নের বালক ছিলেন। তিনি উচ্চতায় বেটে ছিলেন, চেহারার গড়নে অসুন্দর ছিলেন, কাঁধদ্বয় মাথার উপর উঠে গিয়েছিল, এমনকি ঘাড় শরীরের ভেতর ঢুকানো ছিলো। জন্মগতভাবেই তিনি আর পাঁচটি শিশুর থেকে দেখতে ভিন্নরকম ছিলো। দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে তিনি দেখতে খুবই কুৎসিত ছিলেন। কিন্তু তার মা এই সন্তানটিকেই উম্মাহর কিংবদন্তী হিসেবে গড়ে তোলেন।

তিনি তার সন্তানকে এই বলে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন,'দেখো বেটা! তুমি যেখানেই যাবে মানুষ তোমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে। সুতরাং তুমি ইলম অর্জন করো, ইলম তোমাকে সম্মানিত করবে।' (তারীখে দিমাশক: ৫৪/১০৬)

তিনি নিজ জবানে তার জীবনের ঘটনা বলতে গিয়ে বলেন,"আমার আম্মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও আলিমাহ ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন- 'বেটা তোমার শরীরের গঠনটাই এমন যে তুমি অন্য যুবকদের সাথে মিশতে পারবেনা। তাই তুমি ইলম অর্জন করো। তাহলে ইলম এই ক্রুটির পরিপূরক হয়ে যাবে এবং তোমার লাঞ্চনা দূর করে দিবেন।' আল্লাহ তায়ালা উনার এই কথার প্রভাব আমার উপর ফেলেছিলেন, যার কারণে আজ আমি ফিকহ শিক্ষা করেছি এবং কাজি হয়েছি।" (তারিখে দিমাশক: ৫৪/১০৫)

পরবর্তীতে এই ইলম তাকে এতো উঁচুতে নিয়ে গিয়েছিল যে, তিনি বিশ বছর মক্কার কাজি ছিলেন। আর তার প্রভাব তৎকালীন সময়ে এতোবেশি ছিলো যে, বিচারপ্রার্থীরা তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকতো। হ্যা, নিঃসন্দেহে এটিই ইলমের দুনিয়াবী শান যে, দুনিয়ার মানদন্ডে সবচেয়ে অবহেলিত মানুষটিকেও এই ইলম আসমানের চেয়েও উঁচ্চ মর্যাদায় পৌছে দেয়। আখিরাতে না জানি এই মর্তবা আরও কত সুউচ্চ হবে!

মায়েদের নামে পরিচিত হয়েছেন যেসব আলিমগণ:

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের পাতায় এমন অসংখ্য কিংবদন্তী উলামা সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের নাম উল্লেখ রয়েছে যারা পরিচিত হয়েছেন বিশ্বদরবারে নিজেদের মহীয়সী মায়েদের নামে। কারো মা ছিলেন যুগের অনেক বড় আলেমা, ফাযেলা, আবেদা। কারোর মা সন্তানকে অতি উত্তম তারবিয়ায় গড়ে তোলার কারণে লোকমুখে প্রসিদ্ধ। নিচে এমন কিছু আলিম সাহাবী, তাবেয়ী ও তৎপরবর্তীদের নাম তুলে ধরা হলো:

- হযরত শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ (রা:)। মূলনাম আব্দুল্লাহ। উনার মায়ের নাম ছিলো হাসানাহ।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:)। মূলনাম আমর ইবনে কায়েস। উনার মায়ের উপাধি ছিলো উম্মে মাকতুম।
- হযরত মুয়ায ইবনে আফরা (রা:)। উনার নামের নাম ছিলো আফরা বিনতে উবাইদ।
- হযরত ইবনে আয়িশা (রহি.)। মূলনাম মুহাম্মাদ ইবনে হাফস। উনার মায়ের নাম ছিলো আয়িশা।
- হযরত ইবনে বিনতে শাফেয়ী (রহি.)। মূলনাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ। উনার মায়ের নাম ছিল যায়নাব বিনতে ইমাম শাফেয়ী।
- হযরত ইবনে আমামাহ (রহি.)। মূলনাম আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। উনার মায়ের নাম ছিলো আমামাহ।
- হযরত ইবনে বারাকাত (রহি.)। মূলনাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। উনার মায়ের নাম ছিলো বারাকাত।

শেষের কথা

আমাদের দীর্ঘ আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি এই উম্মাহর নারীদের রয়েছে জ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসগাঁথা। আমরা সে জাতির নারীগণ যারা জীবন দিয়ে রেখে গেছেন ইলমের ময়দানে অবদান। আমাদের কন্যারা একসময় ঘরে ঘরে হাফেজা হতো, যুগশ্রেষ্ঠ আলিমাহ, মুহাদ্দিসা, ফকীহা হতো। আমাদের মায়েদের গর্ভ থেকে জন্ম নিতো যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুজাওওয়্যাদ, ক্বারী।

সেই সুন্দরতম ইতিহাসের অনেককিছুই আজ শুধুই ইতিহাস হলেও, মনে রাখতে হবে ইতিহাস ফিরে ফিরে বারবার আসে। আমরা যেন আবারও ইতিহাস বিনির্মাণের কারিগর হই।

‘মিল্লাতের নারীসমাজের প্রতি তার আহ্বান, তারা যেন নজর দেন জাতির ভাগ্য-নির্মাণে এবং জাতির বেদনার সন্ধ্যাকে পরিণত করেন বসন্তের ভোরে। এই বিপ্লব ঘটতে পারে ঘরে কুরআনের ফলগুধারা প্রবাহিত করার দ্বারা; যেমন ওমর-ভগ্নির কুরআন পাঠ বদলে দিয়েছিল ওমর (রা.)-এর তাকদীর। আর তাঁর কথা ও ব্যথা বিগলিত করেছিল ওমর (রা.)-এর হৃদয়।’ -*আল্লামা ইকবাল*

আমাদের প্রতিটি ঘর থেকে আবারও যেন রোজ সকালে ভেসে আসে কুরআনের সুর। আমাদের কন্যাদের ছেলেবেলা যেন কাটে আল্লাহর কালামের শানকে হৃদয় থেকে উপলব্ধি করে হৃদয়ে ধারণের যাত্রা। আমাদের মেয়েরা যেন আবারও হয় সুগভীর ইলমের অধিকারী, ইলমের অসংখ্য ফনে পারদর্শী। মহল্লায় মহল্লায় তাদের দ্বারা আবারও যেন চালু হয় ইলমের হালাকা। যে ইলমের সুধা পান করে সমাজের জাহিলিয়াতে নিমগ্ন অসংখ্য নারীগণ হয়ে উঠবেন আলিমদের মা, মুজাহিদদের মা, মুজতাহিদদের মা। আমাদের মায়েরা যেন উম্মাহর রত্নদের গর্ভে ধারণ করতে শুরু করে।

তারা যেন সমসাময়িক রিদ্দা, ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা খন্ডনে কাজ করে নারীদের নিয়ে। আমাদের যত নারী বিপথের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে তাদের ফেরানোর জন্য আয়িশারা আসুক, আমাতুল ওয়াহেদ সিত্তিয়ারা আসুক, ফাতিমা বিনতে দাক্কাকরা আসুক।

আমাদের কন্যারা ইলমের প্রচার প্রসারে দাঈয়া হোক। আমাদের মায়েরা দাঈদের গড়ে তুলুক, উম্মাহর রাহবারদের জন্ম দিক। সেই প্রচেষ্টায় মেহনত করুক যুগের পর যুগ। শেষ করবো শাইখ আনওয়ার আল আওলাকির একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে-

‘উম্মাহর মেয়েরা ও মায়েরা যদি আবারও দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরে

আর বুদ্ধিমতী হয়;

তাহলে এই উম্মাহ পুণরায় জেগে উঠবে...

সেই দু’আ ও প্রত্যাশায়...

আল্লাহর বান্দী

নওশীন তাবাসসুম

তথ্যসূত্র

■ ■ ■ ■ ■ ■

১) বই: সীরাতে আয়িশা (রা:)।

২) জার্নাল: উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ (রা:) ও তার ফিকহী অভিমত: একটি পর্যালোচনা- মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান।

৩) বই: ইসলামে নারীর ইলমী অবদান।

৪) আর্টিকেল:

- https://www.bbc.com/bengali/articles/c9x938en31ro
- https://www.jugantor.com/islam-life/501702/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87
- https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/husainbinzia/30182731
- https://www.deshrupantor.com/448290/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%80

- https://fateh24.com/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8/
- https://sundormon.wordpress.com/2019/09/09/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8/
- https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/09/15/955482
- https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/08/21/1310549
- https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/08/24/1311434
- https://banglanews24.com/public/islam/news/bd/696350.details
- https://www.mohioshi.com/history-and-tradition-2/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE/

- https://bangla.islamonweb.net/Contribution-of-Muslim-Women-to-Islamic-Education-in-the-Middle-Ages/
- https://www.ourislam24.com/2022/08/04/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE/
- https://www.alkawsar.com/bn/article/598/
- https://www.news24bd.tv/details/142220
- https://at-tahreek.com/article_details/7322
- https://silkcitynews.com/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B7%E0%A7%80%E0%A6%A6
- https://www.alkawsar.com/bn/article/2707

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111390307/